এই লেখাটি "দ্য ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট" এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

"সাইকোথেরাপী আচরণ চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর"

প্রফেসর ডঃ রোকেয়া বেগম
প্রফেসর ও চেয়ারপার্সন
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন ঃ আপনি মনোবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য কিভাবে আগ্রহী হলেন?

উত্তর ঃ আমি যখন বেশ ছোট, স্কুলে পড়ি তখন আমার খালাম্মা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক সদস্য মরহুম বেগম আজিজুন নেছা (যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডীন ছিলেন) ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষা থাকাকালে বি.এড ক্লাসে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিষয়টি পড়াতেন। কিভাবে আমরা শিখি, মনোযোগ দেই, কেন আমরা ভুলে যাই, কিভাবে বুদ্ধি পরিমাপ করা যায় ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে আমি তাঁর কাছ থেকেই প্রথম জেনেছিলাম। বলতে পারেন মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার কৌতুহলের সূত্রপাত হয় সেখান থেকেই। ক্রমে ক্রমে ঐ বিষয় সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানার আগ্রহ হয়। আমাদের সময় ইন্টারমিডিয়েটে কেবল 'চাইল্ড সাইকোলজী' বিষয়টি পড়ানো হতো তাই ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসাবে তখন আমি ঐ বিষয়টি নির্বাচন করি। আমি যখন দর্শনে অনার্সে ভর্তি হই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। কেবল দর্শন বিভাগের অনার্স ক্লাসের পাঠ্যসূচীতে মনোবিজ্ঞান বিষয়টি পড়ানো হতো। প্রথম শ্রেণী পেয়ে অনার্স পাশ করার পর আমি এম. এ. ক্লাসে দর্শন 'বি কোর্স' নিয়ে পড়াশুনা করি (এই কোর্সে মূলতঃ মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো)। আমার আব্বা, আম্মা, খালাম্মা ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম প্রফেসর ডঃ মীর ফখরুজ্জামানের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় পুনরায় এম. এ. পড়ি মনোবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা যিনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী বিষয়ে বিদেশ থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। আমাদের জানতে ইচ্ছা কি কারণে আপনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজী পড়ার সময় থেকে 'এ্যাবনরমাল সাইকোলজী' (অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান) ও 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী' (চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান) বিষয় দু'টি আমার প্রিয় বিষয় ছিল। ১৯৬৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর থেকেই অনার্স ক্লাসে 'অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান' এবং এম.এস.সি ক্লাসে 'চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান' বিষয়টি আমি পড়াতাম। দীর্ঘদিন এই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ফলে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজীর গুরুত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টের প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টের অভাব ভীষণভাবে অনুভব করতাম বিশেষ করে এ বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত কোন মহিলা ছিলেন না। আমি মনঃস্থির করেছিলাম যদি কখনও উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যাই তবে অবশ্যই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজীতে পি-এইচ-ডি করবো। বিশ্ববিখ্যাত মনোঃসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কর্ম জীবনের সঙ্গে জড়িত ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অফ এপ্লাইড এ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী' থেকে 'ঢাকা শহরের শিশুদের আচরণগত সমস্যা' এর ওপর গবেষণা করে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রশ্ন ঃ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টেরা কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করেন? আপনি কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে বেশি আগ্রহী?

উত্তর ঃ একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট সাধারণত মানসিক রোগীদের সুস্থ করতে এবং মানসিক সমস্যা নিরসনে কাজ করে থাকেন। তবে তাঁরা কেবল মানসিক রোগীদেরই চিকিৎসা করেন না শারীরিকভাবে কঠিন রোগ যেমন–এইডস, ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথা এবং নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা যেমন ডায়াবেটিস ইত্যাদিতে মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করে ঐ রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করেন এবং তাদের মানসিক শক্তি যোগানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাদকাসক্তির ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া নানা ধরনের পীড়ন বা চাপ (stress), মানসিক আঘাত বা ক্ষত (trauma), বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতায় বিকারগ্রস্ত, ব্যক্তিদের মানসিক বিপর্যয় রোধ করতে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নানা

প্রকার দুশ্চিন্তা কমাতে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে, আত্মবিশ্বাস স্থাপন করতে, সুস্থ ও গঠনমূলক চিন্তা করতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট সাইকোথেরাপী প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে সাহায্য করেন।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টেরা শিশু থেকে আরম্ভ করে সব বয়সের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, মানসিক রোগ ও মানসিক সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। আমার যদিও সব বয়সের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কাজ করার আগ্রহ আছে তবে শিশু-কিশোরদের মানসিকে রোগ ও সমস্যামূলক আচরণ নিয়ে কাজ করতে আমার আগ্রহ বেশি।

প্রশ্ন ঃ আপনি শিশু-কিশোরদের সমস্যামূলক আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। কোন ধরনের আচরণকে সমস্যামূলক আচরণ বলা হয়?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ যে সমাজে একটি আচরণকে একটি নির্দিষ্ট বয়স ও লিঙ্গের উপযোগী মনে করা হয় সেই বয়স এবং সেই লিঙ্গের শিশুর মধ্যে ভিন্নরূপ আচরণ দেখা দিলে তাকে 'বিচ্যুত আচরণ' বলে। শিশুর কোন আচরণ যদি তার সমাজ এবং কৃষ্টির আদর্শের পরিপন্থী হয় এবং তা শিশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমানে থাকে তবে সে আচরণকে সমস্যামূলক আচরণ বলা হয়। মোট কথা একটি স্বাভাবিক শিশু বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী যে ধরনের আচরণ করে তা থেকে যখন কোন শিশুর আচরণ উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয় তখন সে আচরণকে সমস্যামূলক আচরণ বলা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বয়সের সঙ্গে আচরণ সমস্যার সম্পর্কটি ভাল ভাবে বোঝা যাবে। স্কুলে যাওয়ার আগে অথবা স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম অবস্থায় মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছেদের উদ্বেগ (separation anxiety) একটি শিশুর পক্ষে সাধারণ এবং স্বাভাবিক আচরণ বলে ধরা হয়, কিন্তু একজন যুবকের মধ্যে সেই আচরণের প্রকাশকে বিচ্যুত আচরণ অথবা সমস্যাপূর্ণ আচরণ বলে গণ্য হবে। তাই কোন একটি আচরণকে সমস্যাপূর্ণ আচরণ বলার আগে শিশুর বয়স, লিঙ্গ, সমস্যাটির সংখ্যা, তীব্রতা এবং সমস্যাটি কোথায় কার সঙ্গে হয়েছে সবই ভালভাবে দেখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সাধারণতঃ শিশু-কিশোরদের মধ্যে কি ধরনের আবেগ ও আচরণগত সমস্যা দেখা যায়? ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কাদের এই সমস্যাগুলি বেশি হয়?

উত্তর ঃ শিশু-কিশোরদের নানা ধরণের আবেগ ও আচরণগত সমস্যা দেখা যায় যেমন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য, অপরিপক্কতা, নার্ভাস অনুভব করা, অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদানের অসুবিধা, বাতিক বাধ্যতামূলক আচরণ, অহেতুক ভয় পাওয়া সমাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। অতি চঞ্চলতা বা অতি কর্মতৎপরতা, আক্রমনাত্মক আচরণ, ধ্বংসাত্মক এবং আত্মঘাতী চিন্তা, অপরাধ প্রবণতা, নৈতিকতা বৈকল্য, যৌন সমস্যা, ধুমপান, ড্রাগ বা মাদকাসক্ত হওয়া ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেশে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আচরণ সমস্যার হার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অনেক বিশ। তবে কিছু কিছু সমস্যা যেমন একাকীত্ব অনুভব করা, মনমরাভাব, ভয় পাওয়া, উদ্বেগ অনুভব করা, নিজেকে গুটিয়ে রাখা ইত্যাদি সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

প্রশ্ন ঃ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আবেগ ও আচরণগত সমস্যার কি কোন পার্থক্য আছে? বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই সমস্যার হার কত?

উত্তর ঃ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় আবেগ ও আচরণগত সমস্যার ওপর বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে এই সমস্যার হার উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে প্রায় একই রকম।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, পারিবারিক নানা প্রকার মানসিক চাপ, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকা, প্রতিকুল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ, শিশু লালন পালন সম্পর্কে মা-বাবাদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি শিশু-কিশোরদের নানা মানসিক সমস্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে আর এর প্রায় অধিকাংশ উপাদনগুলি বাংলাদেশে বর্তমান। সুতরাং এখানকার শিশু-কিশোরদের মধ্যে আবেগ ও আচরণগত সমস্যার হার উন্নত বিশ্বের শিশুদের চেয়ে বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সারা বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের আচরণ সমস্যার হারের উপর এখন পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়নি তবে ঢাকা শহরের রমনা থানার ২৭টি স্কুলের দশ বছরের ৬২৭ (৩৪১ জন ছেলে ও ২৮৬ জন মেয়ে) শিশুর আচরণ সমস্যার উপর আমি ১৯৯৩ সনে একটি গবেষণা করেছিলাম তাতে দেখা গেছে মায়ের রিপোর্ট অনুসারে শতকরা ১১.৮ জন ছেলেদের এবং শতকরা ১০.৭ জন মেয়েদের মধ্যে এবং শিক্ষকের রিপোর্ট অনুসারে ১২.৮% ছেলেদের এবং ১১.২% মেয়েদের মধ্যে নানা প্রকার আচরণগত ও আবেগীয় সমস্যা আছে যাদের অনেকের আশু চিকিৎসা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ শিশু-কিশোরদের আবেগ ও আচরণগত সমস্যার চিকিৎসার ব্যাপারে বাংলাদেশের মা-বাবারা কতটুকু সচেতন?

উত্তর ঃ বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি; বিশেষ করে শিশু-কিশোররা যে মানসিক সমস্যায় পরতে পারে বা তাদেরও যে মানসিক রোগ হতে পারে সে ধারণা অনেকের মধ্যেই নেই। এটা অতি দুঃখজনক যে বৈজ্ঞানিক ও কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিশু-কিশোরেরা মানসিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। শিশু-কিশোরদের নানা ধরনের মানসিক সমস্যা সম্পর্কে জনগণ বিশেষ করে বাবা-মাদের সঠিক জ্ঞানের অভাব ছাড়াও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, সুষ্ঠু যাতায়াতের অভাব, রোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলার অক্ষমতা, তাছাড়া 'স্টিগমার' কারণে শিশু-কিশোরদের কোন মানসিক সমস্যা বা রোগ হলে অভিভাবকেরা তা প্রকাশ করতে চান না এবং বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শের জন্য যেতে চান না।

প্রশ্ন ঃ শিশু-কিশোরদের আবেগ ও আচরণগত সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ শিশু-কিশোরদের আবেগ ও আচরণগত মানসিক সমস্যার সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এই ক্ষতির প্রভাবের কথা চিন্তা করে শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় "শিশু-কিশোরদের আবেগ ও আচরণগত মানসিক সমস্যা" নির্বাচন করা হয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার প্রভাব শিশুর নিজের উপরে, তার পরিবার এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপরে পড়ে। এই সমস্ত সমস্যা জর্জরিত শিশুরা লেখা পড়ায় পিছিয়ে পড়ে, অন্যের উপর নির্ভরশীর হয়, নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পরে, মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয় এবং নানা প্রকার শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়। মনে রাখতে হবে শিশু-কিশোরদের মধ্যে নানা প্রকার সমস্যামূলক আচরণ থাকলে তারা কখনো তাদের পরিবার, দেশ ও সমাজে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান তো রাখতে পারবেই না, উপরন্তু তারা সবক্ষেত্রে বোঝা হয়ে বিরাজ করবে। অনেক গবেষণার ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে যে শৈশবকালীন অনেক আচরণ সমস্যা যৌবনে এমনকি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায়। সুতারাং শিশু-কিশোরদের আবেগ ও আচরণগত সমস্যাকে উপেক্ষা না করে যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিৎ।

প্রশ্ন ঃ শিশু-কিশোরদের আবেগ ও আচরণগত সমস্যার চিকিৎসায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা কি ভূমিকা পালন করেন?

উত্তর ঃ আমি আগেই বলেছি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা সাইকোথেরাপী নামক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মানসিক সমস্যার চিকিৎসা করেন। সাইকোথেরাপী আচরণ চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর। বেশিরভাগ আবেগ ও আচরণগত সমস্যা কেবলমাত্র সাইকোথেরাপীর সাহায্যেই সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োজন হয়। দীর্ঘমেয়াদী ফল লাভের জন্য ঔষধ এবং সাইকোথেরাপী একসঙ্গে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সাইকোথেরাপী উন্নত দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং শিশু-কিশোরদের আচরণ সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আমাদের দেশেও শিশু-কিশোরদের আবেগ ও আচরণগত সমস্যার চিকিৎসায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সাইকোথেরাপী ব্যবহার করছেন।

প্রশ্ন ঃ দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা সবাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো অনেক বেশি সচেতন হউন এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। মনে রাখবেন মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব শারিরীক স্বাস্থ্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শারিরীক রোগের মত মানসিক রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা নিজে উপলব্ধি করুন এবং প্রয়োজনে পরিচিত সবাইকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টের শরণাপন্ন হোন এবং জীবনকে সুন্দর ভাবে উপভোগ করুন। যে কথাটি না বল্লেই নয় তা হচ্ছে শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হউন এবং তাদের সুস্থ জীবন ও সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশে সাহায্য করুন। আপনার আমার সবার অতি প্রিয় শিশু-কিশোরদের সঙ্গে এমন কোন আচরণ করবেন না যেজন্য সারা জীবন আপনাকে আফসোস করতে হয়।